পুরানো শাস্ত্র ও সাহিত্য অনুশীলনে পাণ্ডুলিপি চর্চার ভূমিকা প্রসঙ্গে

করুণাসিন্ধু দাস

এক

উপনিষদের যুগ থেকেই নানা বিষয়ে বিদ্যাচর্চার প্রমাণ মেলে। সনৎকুমার ও নারদের সংলাপ থেকে জানা যায়, বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ ছাড়াও রাশিবিদ্যা, গন্ধর্ববিদ্যা ইত্যাদি তখনকার বিদ্যাতালিকায় স্থান পেয়েছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বেদ, দর্শন ও তর্কবিদ্যার পাশাপাশি বার্তা (কৃষি, পশুপালন, ব্যবসাবাণিজ্য) ও দণ্ডনীতি (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) মুখ্য বিদ্যা গণ্য হয়েছিল তাই নয়, যাবতীয় বিদ্যাচর্চার পূর্বশর্ত যে সফল রাষ্ট্রনীতি, তাও স্বীকৃত হয়েছিল। এবং, সব ব্যবস্থার মূলে যে অর্থনীতি, তা মেনে বলা হয়েছিল অর্থ এব প্রধান ইতি। কালক্রমে বিদ্যার আরও শাখা-প্রশাখার বিস্তার ঘটে। যেমন, অথর্ব সংহিতায় গাছপালা, লতাগুল্ম, ওষধি ও রোগ নিয়ে যে ভাবনাগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ছিল, পরবর্তীকালে তা থেকে আয়ুর্বেদ প্রতিষ্ঠা পায়। শুধু মানুষের জন্য নয়, হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি পশুর রোগনির্ণয় ও চিকিৎসা থেকে বৃক্ষায়ুর্বেদ অর্থাৎ গাছ-গাছালির পরিচর্যা পর্যন্ত তা প্রসারিত হয়। বিদ্যা, শিক্ষা, কলা, চারু, কারু নানা নামে এমন অনেক প্রসঙ্গ অতীত ভারতবর্ষে আলোচিত হয়েছে। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে (সূত্র ১/৩/১৬) উল্লিখিত চৌষট্টি কলার মধ্যে নৃত্য-গীত-বাদ্য, চিত্রকলা, সাহিত্য থেকে সাজসজ্জা, প্রসাধন, শরীরচর্চা, রন্ধনকলা কিছুই বাদ পড়েনি। সাহিত্যকার হতে গেলে এসব কিছুই জানা আবশ্যক বলেছিলেন কাব্যমীমাংসার লেখক রাজশেখর। শুধু প্রাজ্ঞজন নয়, লোকসমাজ থেকেও নানা জ্ঞান আহরণের পরামর্শ স্মৃতিশাস্ত্রে মেলে।

মধ্যযুগেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। যেমন, কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম রচিত *চণ্ডীমঙ্গল* থেকে জানা যায়, সেকালে ভাষাশিক্ষার জন্য পাণিনি, অমর, জুমর, পিঙ্গল, উজ্জ্বল দত্ত পড়বার রেওয়াজ ছিল।[১] চৈতন্যদেব প্রথমজীবনে বহুশাস্ত্রবিদ্ নিমাই পণ্ডিত নামে পরিচিত ছিলেন। কলাপ ব্যাকরণে তাঁর লেখা টিপ্পনী বহুল পঠিত হত।[২] তিনি নিজেও এই শাস্ত্র পড়াতেন।[৩]

বলা বাহুল্য, ছাপাখানা প্রবর্তনের আগে পর্যন্ত বিদ্যাচর্চা ও প্রসার হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি দিয়েই নির্বাহ হত। বৌদ্ধবিহারগুলিতে দেশ-বিদেশ থেকে যে বহুসংখ্যক শিক্ষার্থী আসতেন, নিশ্চয় তাঁদের জন্য পুস্তকাগার আবশ্যক ছিল। প্রাচীন রাজ্যশাসন ব্যবস্থায় নানা প্রশাসকদের মধ্যে পুস্তপাল ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদ। হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র (খ্রি. পঞ্চম শতাব্দী) থেকে জানা যায়, রচনার পর তার গুণাগুণ পরীক্ষা করে শোভাযাত্রা সহকারে ওই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি যথাস্থানে নিয়ে যাওয়া হত।[৪] *দেবীপুরাণ*, *স্কন্দপুরাণ*, *বহ্নিপুরাণ*, *নন্দিপুরাণ* ইত্যাদি গ্রন্থে পাণ্ডুলিপির উপকরণ, আচ্ছাদন, দণ্ডাসন, লেখকের গুণাগুণ, বাচকের সাহায্যে পাঠসন্তুলন নানা প্রসঙ্গ জানা যায়। প্রচারের স্বার্থে এবং গ্রন্থনাশের আশঙ্কায় মূল রচনার প্রতিলিপি বা আদর্শ তৈরির কথা রাজশেখরের *কাব্যমীমাংসা*-য় বলা হয়েছে—

সিদ্ধং চ প্রবন্ধম্ অনেকাদর্শগতং কুর্যাত্। যদিত্থং কথয়ন্তি—

নিক্ষেপো বিক্রয়ো দানং দেশত্যাগো'ল্পজীবতা।
ত্রুটিকো বহ্নিরম্ভশ্চ প্রবন্ধোচ্ছেদহেতবঃ।।

পাণ্ডুলিপি দান কিংবা তার উপকরণ দানকে বিদ্যাদানের সমতুল পুণ্যকর্ম গণ্য করা হত। পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি লিখে অর্থ উপার্জনও সৎকর্ম বলে পরিগণিত ছিল। এইভাবে দান, শিক্ষার্থীদের চলাচল ও অন্যান্য কারণে এক প্রদেশের শাস্ত্র প্রদেশান্তরে পৌঁছে যেত। বিদ্যা ও বিদ্যাবাহী পাণ্ডুলিপির এই চিরায়ত গতায়াত আমাদের পাণ্ডুলিপিচর্চার অন্যতম আলোচ্য দিক হওয়া উচিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতীয় পাণ্ডুলিপিসম্ভারই পৃথিবীতে বৃহত্তম এবং তার সিংহভাগ সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র-বিষয়ক। বাকি অন্যান্য ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শাস্ত্র-সংক্রান্ত। তার অতি স্বল্প অংশমাত্র মুদ্রিত ও চর্চিত হয়ে আসছে। ফলে, সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্ররাজির যে মুদ্রিত খণ্ডিত ইতিহাস এখন আমরা আলোচনা করি, তা নিত্যনতুন তথ্যসংযোগে সমৃদ্ধ হচ্ছে, একথা সবসময় স্মরণে থাকে না। শিক্ষাব্রতী আলেকজাণ্ডার ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন (বা বীটন)-এর অকালপ্রয়াণে তাঁর গুণানুরাগী বন্ধুরা যে বীটন সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন, তার দ্বিতীয় বার্ষিক সভায় পঠিত আজ থেকে ১৬০ বছর আগে বিদ্যাসাগরের 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' নিবন্ধটিই ভারতীয় ভাষায় সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ। সংস্কৃতের আকাশে অনেক নক্ষত্র তখনও পর্যন্ত ফোটে নি। স্বয়ং বিদ্যাসাগর এর কয়েক বছরের মধ্যে পুঁথি অবলম্বনে *সর্বদর্শনসংগ্রহ* (১৮৫৩-৫৮), *মেঘদূত* (১৮৬৯), *শকুন্তলা* (১৮৭১), *হর্ষচরিত* (১৮৮৩) সম্পাদনা করেন। এক্ষেত্রে তাঁর নিকটতম পূর্বসূরি মদনমোহন তর্কালঙ্কার তারও কয়েক দশক আগে ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে

স্যার উইলিয়ম জোন্স সংস্কৃত থেকে লাতিন মারফত ইংরাজিতে কালিদাসের *শকুন্তলা* অনুবাদ করলে ১৭৯১ সালে তা থেকে জার্মান ভাষায় যোহন গর্গ ফস্টার অনুবাদ করেন। কবি গ্যেটে এই অনূদিত জার্মান *শকুন্তলা* পড়েই তাঁর মুগ্ধতা প্রকাশ করেছিলেন। মুদ্রিত নয়, জোন্স নিশ্চয় পাণ্ডুলিপি থেকেই *শকুন্তলা* উদ্ধার করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের আগে মহাকবি ভাস নামমাত্র পরিচিত ছিলেন। কালিদাসের *মালবিকাগ্নিমিত্র* নাটকে তাঁকে পূর্বসূরি বলা হয়েছে (ভাসসৌমিল্লকবিপুত্রাদীনাম্)। অলঙ্কারগ্রন্থে লেখা হয়েছিল—

ভাসনাটকচক্রে হি ছেকৈঃ ক্ষিপ্তে পরীক্ষিতুম্।
স্বপ্নবাসবদত্তস্য দাহকোভূন্ন পাবকঃ।।

কেরলের ত্রিবান্দ্রাম থেকে টি গণপতি শাস্ত্রী ১৯০৯ সালে ভাসনাটকচক্রের পুঁথি আবিষ্কার করেন। নানা তর্ক-প্রতিতর্ক থেকে এখন ভাস-সমস্যার সমাধান হয়েছে। ১৯১০ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অশ্বঘোষের *সৌন্দরনন্দ* সম্পাদনা করেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত* (১৮৯৭) পুঁথি তিনি পেয়েছিলেন অনেক আগে। রাধাগোবিন্দ বসাকের সম্পাদনায় তা প্রকাশ করতে ১৯৬৮ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। ১৯২৬ সালে চিন্তাহরণ চক্রবর্তী ধোয়ীর *পবনদূত* সম্পাদনা করেন। কাব্যের মতো শাস্ত্রগ্রন্থ উদ্ধারও চলেছে নানা প্রান্তে। যেমন, গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থের সম্পাদনায় পুরুষোত্তমদেবের *ভাষাবৃত্তি* সৃষ্টিধরের টীকা সমেত প্রকাশিত হয় ১৯১২ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে। বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম থেকে প্রাপ্ত পুঁথির ভিত্তিতে একই গ্রন্থ সম্পাদনা করেন শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী ১৯১৮ সালে। ১৯১৩ খ্রি. পণ্ডিত আশুতোষ শিরোরত্ন সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের ন্যায়পঞ্চানন ও অভিরাম বিদ্যালঙ্কারের লেখা টিপ্পনী দুটির কৃৎ ও কারক-সমাস প্রকরণ উদ্ধার করেন। ভরতমল্লিকের লেখা *কারকোল্লাস* ১৯২৪ খ্রি. জানকীনাথ শাস্ত্রীর উদ্যোগে সম্পাদিত হয়। বোপদেবের নামে প্রচলিত *সর্বশাস্ত্রপ্রবোধিনী* সম্পাদনা করেন ড. ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯৩০-৩১ খ্রি.)। ১৯৪৬ খ্রি. দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য পুরুষোত্তমদেবের *পরিভাষাবৃত্তি*, *জ্ঞাপক সমুচ্চয়* ও *কারকচক্র* সম্পাদনা করেন বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামের পুঁথির ভিত্তিতে। এই ধারায় আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম—

গ্রন্থ	সম্পাদক	সম্পাদনাকাল	উৎস
অভিনয়দর্পণ	মনোমোহন ঘোষ	১৯৩৪	বিশ্বভারতী
চতুরঙ্গদীপিকা	মনোমোহন ঘোষ	১৯৩৮	বিশ্বভারতী
কর্পূরমঞ্জরী	মনোমোহন ঘোষ	১৯৩৯	বিশ্বভারতী
ভরতমল্লিকের সুখলেখন	রামধন শাস্ত্রী	১৯৫৭	সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ

মৈত্রেয় রক্ষিতের ধাতুপ্রদীপ	শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী	বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম
মৈত্রেয় রক্ষিতের তন্ত্রপ্রদীপ	দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল	কোচবিহার লাইব্রেরি
শরণদেবের দুর্ঘটবৃত্তি	টি. গণপতি শাস্ত্রী	ত্রিবান্দ্রম
সর্বানন্দ বন্দ্যঘটীয়ের টীকাসর্বস্ব	টি. গণপতি শাস্ত্রী	ত্রিবান্দ্রম

বৈদিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে চমকপ্রদ আবিষ্কার উড়িষ্যার বাসুদেবপুর থেকে দুর্গামোহন ভট্টাচার্যের সংগৃহীত অথর্ববেদের *পৈপ্পলাদ সংহিতা*। ব্রজবিহারী চৌবের সম্পাদনায় হোশিয়ারপুর থেকে প্রকাশিত *বাধূলগৃহ্যসূত্র* ইত্যাদির নাম এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে অন্য কয়েকটি সম্পাদনা—

ড. সোমা বসু-র *ভদ্রকল্পাবদানসূত্র* (এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা)

ড. দুলালকান্তি ভৌমিকের *কৌতুকরত্নাকর*, ঢাকা

ড. পার্বতী চক্রবর্তীর *সেতুসংগ্রহ*, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. অরুন্ধতী কাঞ্জিলাল, *মুগ্ধবোধ মহাবৃত্তি*

ড. আলপনা চৌধুরীর *বাররুচসংগ্রহ ও তার টীকাচতুষ্টয়*

ড. তুলিকা চক্রবর্তীর *গোবিন্দভট্টরচিত সমাসবাদ*

ড. চন্দন ভট্টাচার্যের *কাণাদভাষারত্ন*

অধ্যাপক সুবুদ্ধিচরণ গোস্বামীর কাণাদটিপ্পনী

বর্তমান প্রবন্ধকারের *অভিরাম* ও ন্যায়পঞ্চাননের দুটি কারকটিপ্পনী ইত্যাদি ইত্যাদি। তিব্বতি/চীনা ইত্যাদি ভাষায় অনূদিত মূল সংস্কৃত গ্রন্থের পুনরনুবাদ এই পর্যায়ের আর-একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। রাহুল সাংকৃত্যায়ন, অনন্তলাল ঠাকুর প্রমুখের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অধ্যাপক মৃণালকান্তি গাঙ্গুলী, ড. সঞ্জিতকুমার সাধুখান প্রভৃতি গবেষক একাজ করে চলেছেন। সংস্কৃত বিদ্যার ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রাচীন তুরফান পুঁথি আবিষ্কৃত না হলে কে জানতেন তদানীন্তন ভারতের প্রাচীনতম রূপক নাট্যের কথা? তিব্বতি/চীনা অনুবাদ থেকেই জানা সম্ভব হয়েছে যে শ্রীহর্ষের *নাগানন্দ* ভারতে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী চার অঙ্কের নাটিকা হলেও, অনুবাদের সময় অতিরিক্ত অঙ্ক ছিল।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, সবচেয়ে বেশিসংখ্যক পুঁথি পাওয়া গেছে জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও ব্যাসদেবের মহাভারতের। গীতগোবিন্দের সাড়ে চার হাজার আর মহাভারতের আড়াই হাজার।

যে-কোনো প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্য সম্বন্ধে এই চর্চা সুফলপ্রসু হতে বাধ্য। বাংলা সাহিত্যের আদি ও মধ্যযুগের ইতিহাসও তৈরি হয়েছে পুঁথি আবিষ্কার অবলম্বনে। যেমন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদ-এর পুঁথি নেপাল থেকে সংগ্রহ করেন ১৯০৭ খ্রি. অর্থাৎ

১৩১৪ বঙ্গাব্দে। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বাঁকুড়ার গ্রাম থেকে ১৯০৯ খ্রি. (১৩১৬ বঙ্গাব্দে) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি আবিষ্কার করেন। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের উদ্যোগে দ্বিজমাধবের *গঙ্গামঙ্গল* ও মীর ফয়জুল্লাহ্-র *গোরক্ষবিজয়* ইত্যাদি নয়টি গ্রন্থ প্রকাশের আলো দেখে। শেষোক্ত গ্রন্থ (১৯১৭) সম্বন্ধে সাহিত্যবিশারদ জানান 'যতগুলি প্রতিলিপি পাইয়াছি...তন্মধ্যে একটি মুসলমানের এবং একটি বৌদ্ধের লেখা, সবগুলিই হিন্দু প্রতিলিপিকারদের হস্তলিপি।' *ইউসুফ-জোলেখা* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত। মুহম্মদ এনামুল হক প্রাপ্ত পাঁচটি পুঁথি থেকে সমন্বিত পাঠ প্রস্তুত করেন এজন্য। বাহরাম খান লিখিত *ইমাম-বিজয়*-এর পাঠোদ্ধার করেছেন আলী আহমদ। একই গ্রন্থকারের *লায়লী-মজনু* এবং খণ্ডিত পুঁথি অবলম্বনে *হানিফা কয়রাপরী* সম্পাদনা করেছেন আহমদ শরীফ। কৃত্তিবাসের রামায়ণ আদিকাণ্ড দশটি পুঁথি অবলম্বনে সম্পাদনা করেছিলেন নলিনীকান্ত ভট্টশালী (১৩২৯)। মূল পুঁথি ধরা হয় জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে প্রাপ্ত ১৬৪৯ খ্রি.-এর একটি প্রতিলিপিকে, যা এখন আর পাওয়া যায়নি। এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপনার সময় উইলিয়াম ক্রাসি হ্যালহেড যে প্রতিলিপি পান তা ব্রিটিশ মুজিয়মে রক্ষিত। সুখময় মুখোপাধ্যায় (১৯৮১) এই পুঁথি অবলম্বনে সমগ্র কৃত্তিবাসি রামায়ণ সম্পাদনা করেছেন। মালাধর বসু অর্থাৎ গুণরাজ খান কৃত *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* বা *গোবিন্দবিজয়* (১৪০২ শকাব্দ) ভাগবত পুরাণের প্রাচীন বঙ্গানুবাদ। কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এর অন্তত পনেরোটি প্রতিলিপি আছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত চারটি পুঁথি অবলম্বনে শ্রীরায়বিনোদ রচিত *পদ্মাপুরাণ* মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া-র সম্পাদনায় ১৯৯১ খ্রি. প্রকাশ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ২০০২ সালে কবি হামিদ-প্রণীত *সংগ্রামহুসন* কাব্যখানিও তিনি সম্পাদনা করেছেন। তাঁর সাম্প্রতিক সম্পাদনা সিলেটি নাগরীতে লেখা *চিকিৎসাসংগ্রহ*। বস্তুত তাঁর কারবালা কাহিনি নির্ভর সাহিত্য নিয়ে গবেষণা ও সম্পাদনা, ড. কল্পনা ভৌমিকের কবীন্দ্র মহাভারত সম্পাদনা ও গবেষণার মতো নানা শ্রদ্ধেয় দৃষ্টান্ত আমাদের স্মরণে থাকবে।

বস্তুত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, মুহম্মদ এনামুল হক, আলী আহমদ, আহমদ শরিফ মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পুনর্নির্মাণের মুখ্য কারিগর বলা চলে। সাহিত্যবিশারদ দেড় শতাধিক কবিকে আবিষ্কার করেছেন। আলাওল, দৌলত কাজী, শাহ মুহম্মদ সগীর, দৌলত উজির বাহরাম খান, সৈয়দ সুলতান, শেখ ফয়জুল্লাহ, মুহম্মদ কবির, মাগন ঠাকুর, ফকির গরীবুল্লাহ, আবদুল হাকীম, মুহম্মদ খান, শেখ পরাণ, শা বারিদ খান, দোলা গাজী, শেখ চাঁদ, হায়াত মামুদ, সৈয়দ মর্তুজা, জয়েন উদ্দীন, মুহম্মদ আকিল, মুহম্মদ নেয়াজ প্রমুখ তাঁরই আবিষ্কার। ত্রিশজন হিন্দু কবির সাহিত্য

নিদর্শনও তিনি প্রথম আবিষ্কার করেন—শ্রীধর কবিরাজ, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, দ্বিজ মাধব, রতিদেব, রামরাজা, মুক্তারাম সেন, দ্বিজ লক্ষ্মণ, গোবিন্দদাস। সৈয়দ সাজাদ হোসেন যথার্থই বলেছেন—'without him a whole chapter in the annals of Bengali literature would have remained unknown. Posterity owes him a debt of profound gratitude for his service to literature.'

সাহিত্য বিশারদ সম্পাদিত গ্রন্থ দশটি (অসম্পূর্ণ আলাওলের পদ্মাবতী সমেত) :

১. নরোত্তম ঠাকুরের *রাধিকার মানভঙ্গ* (১৯০১)। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভূমিকায় লেখেন 'শ্রী আবদুল করিম... সম্পাদনা কার্যে যেরূপ পরিশ্রম, যেরূপ কৌশল, যেরূপ সহৃদয়তা ও যেরূপ সূক্ষ্মদর্শিতা প্রদর্শিত করিয়াছেন, তাহা সমস্ত বাংলায় কেন, সমস্ত ভারতেও বোধ হয় সচরাচর মেলে না। এক একবার মনে হয় যেন কোন জার্মান এডিটর এই গ্রন্থ সম্পাদনা করিয়াছেন।' ২. কবিবল্লভের *সত্যনারায়ণের পুঁথি* (১৯১৫)। ৩. দ্বিজ রতিদেবের *মৃগলুব্ধ* (১৯১৫), ৪. রামরাজার *মৃগলুব্ধসম্বাদ* (১৯১৫), ৫. দ্বিজমাধবের *গঙ্গামঙ্গল* (১৯১৬), ৬. আলীরাজা ওর্ফে কাবু ফকিরের *জ্ঞানসাগর* (১৯১৭), ৭. বাসুদেব ঘোষের *শ্রীগৌরাঙ্গসন্ন্যাস* (১৯১৭), ৮. মুক্তারাম সেনের *সারদামঙ্গল* (১৯১৭), ৯. শেখ ফয়জুল্লাহ্‌র *গোরক্ষবিজয়* (১৯১৭)। ১০. ৩৮টি পুঁথি পর্যালোচনা করে আলাওলের *পদ্মাবতী* সম্পাদনা যা জীবৎকালে তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি।

আলী আহমদ সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ১০৩০টি—তার মধ্যে ৫৬০টি মুসলিম পুঁথি, ৪৭০ টি হিন্দু পুঁথি। তাছাড়া ৫৬৯টি মুদ্রিত দোভাষী পুঁথি। *বাংলা কলমী পুঁথির বিবরণ* (প্রথম ভাগ, ১৯৪৭)-এ তিনি ৩৫৬টি বাংলা পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। ১৯৪৭ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাণ্ডুলিপি সংরক্ষক হন। ১৯৮৫-তে প্রকাশ করেন *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী*। ১৮৫০-১৯৪৭ এই সময়ে লেখা মুসলিম সাহিত্যের পরিচয় এতে নিবদ্ধ। এছাড়া তিনি তিনটি পুঁথি সম্পাদনা করেন। (১) সৈয়দ সুলতানের *ওফাতে রসুল* (১৯৪৯)। এতে আছে সেই বিখ্যাত উক্তি—

যারে যেই ভাষে প্রভু করিছে সৃজন
সেই ভাষ তাহার অমূল্য সেই ধন।

(২) দৌলত উজির বাহরান খানের *ইমাম বিজয়* (১৯৬৯)।

(৩) আবদুল হাকিম রচিত *নূরনামা* (১৯৭০)। বঙ্গভাষা-বিরোধীদের সম্বন্ধে এখানে কঠোর নিন্দাবাক্য মেলে।

যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবানি।
সে সব কাহার জন্ম নির্নএ না জানি।।

দেশী ভাষা বিদ্যা জার মনে না যুয়াএ।
নিজ দেশ ত্যাগি কেন বিদেশে না যাএ।।
মাতা পিতামহ ক্রেমে বঙ্গেতে বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত য়তি।।

আলী আহমদ এক জায়গায় লিখেছেন—'প্রাচীন পুঁথিপত্র লইয়া গবেষণা করাই আমার বাতিক।' আহমদ শরীফ সম্পাদিত পুঁথির সংখ্যা ৪০-এর বেশি। যেমন—

(১) দৌলত উজির বাহরান খানের *লায়লী মজনু*
(২) জয়েনউদ্দীন-এর *রসুলবিজয়*
(৩) কোরেশী মাগান-এর *চন্দ্রাবতী*
(৪) আফজল আলীর *নসিহতনামা*
(৫) দোলা গাজীর *সয়ফুলমুকুল বদিউজ্জামাল*
(৬) আলাউল-এর *সিকান্দারনামা*
(৭.৮) সৈয়দ সুলতানের *নবীবংশ, রসুলচরিত*
(৯) মুহম্মদ আকিল-এর *মুসানামা*
(১০) শ্রীধরের *বিদ্যাসুন্দর*
(১১) বিদ্যাপতির *ব্যাড়িভক্তিতরঙ্গিণী*
(১২) উইলিয়াম কেরীর *ভাষাকথাক্রম*
(১৩) কবিচন্দ্র মিশ্রের *গৌরীমঙ্গল*
(১৪) খোন্দকার নসরুল্লাহ-এর *শরীয়তনামা* ইত্যাদি।

দুই

অখণ্ড বঙ্গভূমিতে সারস্বতচর্চার অনেক দিক পুঁথি অনুশীলন ছাড়া অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। সংস্কৃত ব্যাকরণের কলাপ, মুগ্ধবোধ, সংক্ষিপ্তসার, সারস্বত, সুপদ্ম, হরিনামামৃত, প্রয়োগরত্নমালা সম্প্রদায়গুলি বিশেষভাবে ভারত উপমহাদেশের পূর্ব ও উত্তরপূর্বভাগে বিকাশ লাভ করেছিল। সূত্র, বৃত্তি, টীকা, টিপ্পনী, পরিশিষ্ট শত শত পাণ্ডুলিপি এখনও অনালোচিত পড়ে আছে। অমরকোষের টীকাসর্বস্বে (খ্রি. একাদশ শতাব্দী) কয়েকশত দেশি শব্দ তালিকাভুক্ত আছে। গ্রন্থটি ত্রিবান্দ্রম থেকে প্রকাশিত হয়েছে প্রায় একশো বছর আগে। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত ওড়িয়া লিপির পুঁথি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত বাংলা লিপির পুঁথি মিলিয়ে শব্দগুলি যথাযথভাবে শনাক্ত করার জন্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯৩১ সালে পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেকাজ কি আমরা করেছি?

বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্যের কারকটিপ্পনীর একটি প্রতিলিপি রবীন্দ্রভারতীতে ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর পুঁথিশালায় আছে, আর-একটি বিশ্বভারতী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ন্যায়পঞ্চাননের ব্যাকরণদীপিকার কারক অংশ আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে, সন্ধি অংশ রবীন্দ্রভারতীতে, সমাস, তদ্ধিত ও সুবন্ত পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বাসুদেবপুরে পরিব্রাজক পঞ্চানন রায় মুজিয়ম-এ। চৈতন্যদেবের শিক্ষক গঙ্গাদাস ছন্দোমঞ্জরীর জন্য বিখ্যাত। *কাব্যশিক্ষা* নামে তাঁর পাণ্ডুলিপি (১০২৯ ডি)-টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত, তা প্রকাশিত হলে জানা যাবে সাহিত্যমীমাংসা বিষয়েও তিনি কতদূর প্রাজ্ঞ ছিলেন। পুরুষোত্তমদেবের ভাষাবৃত্তির সম্পূর্ণ প্রতিলিপি এবং সৃষ্টিধরের লেখা তার টীকার অনেকগুলি পাণ্ডুলিপি ঢাকা ও রাজশাহীতে রক্ষিত। ভাষাবৃত্তির দৃষ্টান্তমালা প্রমাণ দেয়, পুরুষোত্তমদেব বুদ্ধভক্ত ছিলেন। পাণিনি ব্যাকরণের বৈদিক অংশের সূত্রগুলি বাদ দিয়ে শুধু লৌকিক সংস্কৃত-সংক্রান্ত সূত্রগুলি ভাষাবৃত্তির আলোচ্য। সৃষ্টিধরের (১০৭০ খ্রি.) টীকা না থাকলে জানা যেত না, লক্ষ্মণসেনের নির্দেশেই গ্রন্থকার কাজটি করেছিলেন (লক্ষ্মণসেনস্য আজ্ঞয়া)। বিষ্ণুভক্ত লক্ষ্মণসেনের সঙ্গে বুদ্ধভক্ত পুরুষোত্তমদেবের সুসম্পর্ক এতে বোঝা যায়। প্রসঙ্গত এমন আরও কয়েকটি পাণ্ডুলিপির উল্লেখ করা এখানে আবশ্যক।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আই.সি.সি.আর. টেগোর চেয়ার অধ্যাপক হিসাবে কাজ করতে গিয়ে লক্ষ করি সেখানকার গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপি বিভাগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র-সাহিত্যের অমূল্য কিছু পুঁথি রক্ষিত আছে। তার মধ্যে লীলাশুকের *কৃষ্ণকর্ণামৃত* (৪৩৮৮), দুঃখী শ্যামাদাসের *গোবিন্দমঙ্গল* (ক্রম, ১০, ২১৮), কৃষ্ণদাসের *প্রেমভক্তিরত্নাবলী* (৭১২), *স্বরূপপ্রকর্ষবর্ণন* (২০৩), শ্রীজীবের *শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল* (২০৩), কবিরাজ ঘোষের *চৈতন্যমঙ্গল* (২০৪), নরোত্তমদাসের *প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা* (৩২৪ ভি), রামচন্দ্রের *কৃষ্ণলীলামৃত* (৭২৫), দ্বিজমুকুন্দের *জগন্নাথমঙ্গল* (৮৩৪), ভাগবতাচার্যের *প্রেমতরঙ্গিণী* (৮৫৪), গুণরাজ খানের *মণিহরণ* (৭৯এ, ৭৪৪, ৯৪১), *ঊষাহরণ* (৯৪২, ১১০৬ই) *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* (৮৭২), *গোবিন্দবিজয়* (৭৪৪, ৯৪১), ত্রিলোচনদাসের *বৃহন্নিগম* (১০৯৯), নরোত্তমদাসের *প্রার্থনা* (১১০৬ এ, বি), *গৌরাঙ্গসন্ন্যাস* (৯৪৮), মাধবের *শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল* (২১ বি), রাধামোহনের *পদামৃতসমুদ্র* (৬), যদুরামদাসের *কৃষ্ণচন্দ্রশতনাম* (৮৭৪ জে), জয়দেবের *গীতগোবিন্দ*-এর চৈতন্যদাস ও রসময় দাস কৃত বঙ্গানুবাদ (২৫৫৯) ইত্যাদি বিশেষভাবে নজরে আসে। এই তালিকায় যদুনন্দনদাসের তিনটি কৃতির পাণ্ডুলিপি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে দেখার অবকাশ মেলে। ১. চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখা তেইশটি সর্গে সম্পূর্ণ সংস্কৃত মহাকাব্য গোবিন্দলীলাকৃত-এর

বঙ্গানুবাদ; ২. রায়রামানন্দের লেখা সংস্কৃত *জগন্নাথবল্লভ* নাটকের বঙ্গানুবাদ; ৩. শ্রীরূপগোস্বামীর *উজ্জ্বলনীলমণি* নামে সংস্কৃতে লেখা অসামান্য তত্ত্বগ্রন্থের বাংলা পদ্যে সংক্ষিপ্ত রূপান্তর *উজ্জ্বলকিরণ*। তাছাড়া নিদান বঙ্গানুবাদসহ (অসম্পূর্ণ) অনুবাদক মাধবকর (৩০৩), দায়ভাগার্থদীপিকাভাষাবিবরণ—রঘুনাথশিরোমণিভট্টাচার্যকৃত, বৃহস্পতি রায়মুকুটের পদচন্দ্রিকা (অমরকোষের টীকা) (৯৮৫), উইলিয়ম কেরী—ভাষাকথা (কর্ম) ক্রম (৩০৭১) ইত্যাদি।

প্রায় ত্রিশ হাজার শিরোনাম সম্বলিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিসম্ভার প্রমাণ করে, উপমহাদেশের এই ভূখণ্ডে অন্য নানা বিদ্যার পাশে সংস্কৃত ব্যাকরণ ব্যাপকভাবে অনুশীলন করা হত। তার মধ্যে কাতন্ত্র বা কলাপ ছিল মুখ্য, যা সংগ্রহের দীর্ঘ তালিকা থেকে প্রমাণিত হয়। *কাতন্ত্রবৃত্তিপঞ্জিকা, কলাপতত্ত্বার্ণব, কলাপচন্দ্র, কাতন্ত্রপরিশিষ্ট, পরিশিষ্টপ্রবোধ* তো আছেই, বিশ্বেশ্বর তর্কাচার্যের *আখ্যাতব্যাখ্যান* (সম্পূর্ণ), *কাতন্ত্রগণমালা, ব্যাখ্যাসার*, রমানাথ চক্রবর্তীর *শব্দসাধ্যপ্রয়োগ* বা *শব্দসাধ্যপ্রবোধিনী* (৩২০৪) ইত্যাদি স্বল্পপরিচিত গ্রন্থও আছে। তেমনি আছে সারস্বতের প্রভাবতী নামে *সারস্বতবৃত্তিপঞ্জিকা* (শ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য লিখিত) (১৪০ বি-ক), *মুগ্ধবোধের শব্দকল্পদ্রুম* (৩২০৯), *ভট্টিকাব্যের মুগ্ধবোধিনী টীকা* (২১৫৪-বি) ইত্যাদি। এছাড়া, *ব্যাকরণশ্লোক* (১৮৮৫), *ব্যাকরণসমাস* (২১৯৫-বি), *ব্যাকরণপ্রসঙ্গ, ব্যাকরণবিষয়সংগ্রহ* নামে অনির্ধারিত কিছু ব্যাকরণপত্র আছে যা থেকে দুর্লভ কিছু গ্রন্থ বা গ্রন্থাংশ পাওয়া সম্ভব। অলঙ্কারগ্রন্থ হিসেবে ভানুদত্ত মিশ্রের *রসমঞ্জরী*, রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশের *কাব্যচন্দ্রিকা* বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দর্শনের মধ্যে নব্যন্যায়, বেদান্তের নানা গ্রন্থ আছে। যেমন, রামশরণের *শব্দরত্ন*, কৃষ্ণনাথের *প্রমাণরহস্য* শব্দার্থতত্ত্বের মূল্যবান গ্রন্থ।

বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ নিয়ে আলাদাভাবে উল্লেখ করতেই হয়। এখানে সংস্কৃত বিদ্যার নানা অমূল্য গ্রন্থের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ উল্লেখের দাবি করে। যেমন,

ঋগ্‌বেদীয়—দশকর্মপদ্ধতি, ঋগ্‌বেদীয়—পার্বণশ্রাদ্ধপ্রয়োগ, ঋগ্বেদীয় কুশণ্ডিকা; সামবেদপার্বণশ্রাদ্ধপ্রয়োগ, ছন্দোগানাং বৃষোৎসর্গপ্রয়োগ, সামবেদীয় কুশণ্ডিকাবিধি; জগদীশ্বরীপূজা, গজাশ্বাদিবধপ্রায়শ্চিত্ত, কূপপ্রতিষ্ঠা, কূপোৎসর্গবিধি, সত্যনারায়ণব্রতকথা, জন্মাষ্টমী ব্রত, অমাবস্যাব্রতকথা; তালনবমীব্রত, বনদুর্গাপূজাবিধি, তীর্থযাত্রাবিধি, বিষহরিপূজাবিধি, হরিনামসংগ্রহকবচ, চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী, পুণ্ডরীকাক্ষের *ভট্টিটীকা*, রাজীবশর্মার *ঘটকর্পরটীকা*, ন্যায়বাগীশের *কাব্যপ্রকাশটীকা*, রামচন্দ্রের *কাব্যচন্দ্রিকা, রতিমঞ্জরী*।

দর্শনের মধ্যে অন্তত ১৫০টি নব্যন্যায়গ্রন্থ ছাড়াও বৈশেষিক, মীমাংসা, বেদান্ত গ্রন্থ এবং তন্ত্রবার্তিক, পদার্থধর্মসংগ্রহ, তন্ত্ররত্ন, পঞ্চকোষবিবেকব্যাখ্যা, যোগপ্রকরণ, যোগ্যানুপলব্ধিবাদ।

এখান থেকেই শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী ও দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য পাণিনিব্যাকরণের কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধার করেছেন। তার মধ্যে পুরুষোত্তমের *ভাষাবৃত্তি, লঘুপরিভাষাবৃত্তি, জ্ঞাপকসমুচ্চয়, কারকচক্র* ও মৈত্রেয়রক্ষিতের *ধাতুপ্রদীপ* উল্লেখযোগ্য।

পাণ্ডুলিপি সন্ধানও গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সারা দেশে, প্রতিষ্ঠানে বা বাড়িতে যত পাণ্ডুলিপি এখনও অপঞ্জীকৃত অবস্থায় আছে তার সমীক্ষা অত্যন্ত জরুরি। একই গ্রন্থের এক এক অংশ ভিন্ন জায়গায় থাকা সম্ভব। আর আলাদা আলাদা প্রতিলিপি হলে তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে সমন্বিত পাঠ নির্ণয় সহজ হবে।

ঐতিহাসিক কারণে সংস্কৃতবিদ্যার কিছু কিছু অংশ দেশের সীমা ছাড়িয়ে দূর দেশান্তরে পৌঁছেছিল। বৈদ্যশাস্ত্র নিয়ে আয়ুর্বেদাচার্যরা বিদেশে যাওয়ার জন্য আহূত হতেন। তাঁদের মূলগ্রন্থ স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করে রাখা হত। বাগদাদের বিশ্ববিখ্যাত ম্যুজিয়ম-এ এমন গ্রন্থ দেখার অভিজ্ঞতা প্রবীণ প্রাচ্যবিদের মুখে শুনেছি। কয়েক বৎসর আগে সংঘটিত ইরাক আক্রমণে তা বিস্মৃতির অতল গর্ভে চলে গেছে নিশ্চয়। তিব্বতের মধ্য দিয়ে চীনের অভ্যন্তরে, জাপানে, মোঙ্গলিয়ায় বহু বৌদ্ধশাস্ত্র এইভাবে ওই অঞ্চলের ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। তা থেকে মূল গ্রন্থ উদ্ধারের জন্য রবীন্দ্রনাথের আগ্রহের সীমা ছিল না। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে শিতোকু হোরি নামে এক নবীন বৌদ্ধ ভিক্ষু জাপান থেকে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন প্রথম বিদেশি শিক্ষার্থী হিসাবে। কয়েক মাসের মধ্যে সংস্কৃত শিখে তিনি *অমরকোষ* অনুবাদ সম্পন্ন করেন। তাঁকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর প্রিয় সুহৃদ বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু পরিকল্পনা করেন, সংস্কৃতে ও ইংরাজিতে অভিজ্ঞ কোনো ছাত্রকে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে তিব্বতি ও অন্যান্য ভাষা ও লিপি শিখিয়ে নিয়ে হোরির সঙ্গে জাপান ও চীনের বৌদ্ধ প্রার্থনালয়গুলিতে পাঠিয়ে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের প্রতিলিপি নিয়ে আসতে হবে। হোরির ডায়ারি থেকেও এর সমর্থন মেলে।* হোরির আকস্মিক অকালমৃত্যুতে এ পরিকল্পনা কার্যকর হয়নি বটে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ থেমে যাননি। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে বিধুশেখর শাস্ত্রী বারাণসী থেকে শান্তিনিকেতনে যোগ দেন এবং ক্রমশ পালি, আবেস্তা, তিব্বতি ও চীনা ভাষা শিখে নেন। আদি ব্রাহ্মসমাজে সংগৃহীত শতাধিক পুঁথি ১৩১২-১৩১৬ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে দান করেন রবীন্দ্রনাথ। তার মধ্যে কাশী থেকে সংগৃহীত সংস্কৃত পুঁথিও ছিল। এদিকে শান্তিনিকেতনেও কিছু পুঁথি দান করা হয়, সংগ্রহও চলতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তনায়

অবনীন্দ্রনাথ ৫১টি ইসলামি পুঁথি সংগ্রহ করে শান্তিনিকেতনে দান করেন; গগনেন্দ্রনাথ সাহিত্য পরিষদকে দেন তেরোখানা পুঁথি যার অন্যতম ছিল দ্বিজমাধবের *কৃষ্ণমঙ্গল*। ১৯২৩ সালে বিশ্বভারতীতে পুঁথি বিভাগ স্থাপিত হয়। গবেষণার লক্ষ্যে বলা হয় 'It is recovering lost works in Sanskrit from Tibetan and Chinese sources'. *হিন্দু* ও *বিহার হেরাল্ড* পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ আবেদন করেন যার লক্ষ্য 'preserving old manuscripts of Sanskrit and Vernacular literature from destruction and disappearance'. ১৯২১ সালে সিলভাঁ লেবি এখানে যোগ দিয়েই প্রবোধচন্দ্র দাশগুপ্তকে নিয়ে নেপালে গিয়েছিলেন পাণ্ডুলিপি সন্ধানে। ওই সময় ঢাকা থেকেও পুঁথি সংগৃহীত হয় শান্তিনিকেতনে। ১৯২৩ সালে বরোদা থেকে অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী এসে এই কাজে সারা ভারত পরিক্রমা করেন যার ফলে কয়েক হাজার পুঁথি সংগৃহীত হয় সংস্কৃত, তামিল, মালয়ালম, ওড়িয়া, বাংলা ইত্যাদি ভাষায়। ১৯২৪ সালে নটেশ আয়াস্বামী শাস্ত্রিগাল যোগদান করেন। এরপরেও ১৯২৭ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ভ্রমণের সময় এবং ১৯৩২ সালে পারস্য ভ্রমণের সময় রবীন্দ্রনাথ ওই সব দেশ থেকে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে পনেরোটি প্রতিলিপি নিয়ে *মহাভারত* সম্পাদনার কাজ শুরু হয় বিশ শতকের তৃতীয় দশকে। ভিন্টারনিত্স ও লেসনি তখন শান্তিনিকেতনে পরিদর্শক অধ্যাপক হয়ে এসেছেন। হরদত্ত শর্মা ও মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীরামস্বামী আয়েঙ্গার এই কাজে যুক্ত হন। পুনার ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট সহযোগী ভূমিকা নেয়। কয়েক দশকের চেষ্টায় পুনা থেকে বেদব্যাসের সমগ্র মহাভারতের সবিমর্শ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এ কাজের সূচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তা যেন ভুলে না যাই।

পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে আগ্রহ প্রথম জীবন থেকেই কবির ছিল। ১২৯৮ বঙ্গাব্দে *সাধনা* পত্রিকায় ত্রিশ বছর বয়সী রবীন্দ্রনাথ 'প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার' নামে একটি ছোটো প্রবন্ধ লিখে এ বিষয়ে তাঁর অভিমত জানান :

'পতিনিষ্ঠ সাবিত্রীর ন্যায় তাঁহারা অনেক সত্যবান গ্রন্থকে যমের দ্বার হইতে ফিরাইয়া লইয়া আসিয়াছেন।' অতঃপর কবির ক্ষুব্ধ প্রশ্ন—'আমাদের দেশেও কি অনেক পুঁথি নানা গোপন স্থানে পুনরাবিষ্কারের প্রতীক্ষা করিয়া নাই?' বিদেশিদের ভরসায় না থেকে নিজেদের কাজে নামার আহ্বান তখন থেকেই তাঁর মনে ছিল। *ভারতী* পত্রিকায় (১৩০৫) দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-র আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লেখেন—'বাঙলা ভাষাতত্ত্ব সন্ধানের একটি ব্যাঘাত প্রাচীন পুঁথির দুষ্প্রাপ্যতা। কবিকঙ্কন চণ্ডী প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যগুলি অল্পে অল্পে পরিবর্তিত ও সংশোধিত হইয়া আসিয়াছে।

প্রাচীন আদর্শ পুঁথি কোনো এক পুস্তকালয়ে যথাসম্ভব সংগৃহীত থাকিলে অনুসন্ধিৎসুর পক্ষে সুবিধার বিষয় হয়। সাহিত্য পরিষদের অধিকারে এইরূপ একটি পুস্তকালয় স্থাপিত হইতে পারিবে ইহাই আমরা আশা করি।' ওই বছরই পরিষদে প্রাচীন সাহিত্য সমিতি গঠন করে রবীন্দ্রনাথ ও দীনেশচন্দ্র সেনকে তার সদস্য করা হয়।

এরপর ১৩১৩ বঙ্গাব্দ, ফাল্গুন মাসে বরিশাল সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বিস্তৃত পরিকল্পনা পেশ করেন।

'পরিষৎ স্বদেশের ভাষাতত্ত্ব ও প্রাচীন সাহিত্যকথা...সংগ্রহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। দেশের হিতসাধনের ইহাই ভিত্তিস্থাপন। যে প্রদেশে সাংবৎসরিক অধিবেশন হইবে সেখানকার প্রাচীন পুঁথি পুরালিপি প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শনী হইলে কত উপকার হইবে। প্রত্যেক প্রদেশে সাহিত্য পরিষদের একটি করিয়া শাখা স্থাপিত হওয়া আবশ্যক।...রক্ষণযোগ্য প্রাচীন পুঁথি ও ঐতিহাসিক সামগ্রী সংগ্রহ করিবেন।"

বাংলা ভাষার বানান বিতর্ক নিয়ে রবীন্দ্রনাথ নানা দিক থেকে তাঁর মতামত লিপিবদ্ধ করেছিলেন। বানান সংস্কার প্রসঙ্গে ১৯৩৫ সালে তিনি লেখেন—'অচিরে এমন সাহসিকের সমাগম হবে যাঁরা নিঃসংকোচে বানানকে দিয়ে সম্পূর্ণভাবেই উচ্চারণের সত্য রক্ষা করবেন।' অনেক বৎসর ব্যাপী ভাবনা-চিন্তার পথ বেয়ে তাঁকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয়েছিল। 'বাংলা বানান' (১৩২৩) প্রবন্ধে তার সাক্ষাৎ প্রমাণ স্মরণীয়। 'প্রাকৃত ও পালি, বানানের দ্বারা নির্ভয়ে নিজের শব্দেরই পরিচয় দিয়াছে, পূর্বপুরুষের শব্দতত্ত্বের নয়। কেননা বানানটা ব্যবহারের জিনিস, শব্দতত্ত্বের নয়। পুরাতত্ত্বের বোঝা মিউজিয়ম বহন করিতে পারে, হাটে বাজারে তাহাকে যথাসাধ্য বর্জন করিতে হয়।' এরপর নিজ সিদ্ধান্তের সমর্থনে তিনি বাংলা পুঁথির উচ্চারণানুগ বানানরীতির কথা তুলে বলছেন—'প্রাচীন বাঙালি বানান সম্পর্কে নির্ভীক ছিলেন, পুরানো বাংলা পুঁথি দেখিলেই তাহা বুঝা যায়।' বানান ছাড়া সাধু-চলিত রীতি, নামধাতু ইত্যাদির বিশেষ করে চর্চা করা দরকার নানা পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে।

রবীন্দ্রনাথের জন্মের সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন সম্পন্ন হল। তাঁর স্মৃতিকে সম্মান জানাতে পাণ্ডুলিপি চর্চায় আমাদের তন্নিষ্ঠ মনোযোগ প্রত্যাশিত। রবীন্দ্রনাথের বহুমাত্রিক শিক্ষাভাবনার আদর্শ মনে রেখে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে পাণ্ডুলিপি চর্চা ও গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক মনে করি। দেশের সরকার ও বিদ্বৎসমাজের সহৃদয় দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করছি।

তথ্যসূত্র

১. অষ্টশব্দি সুবন্ত পাণিন/পড়ে দত্ত শ্রীয়পতি/সন্ধিমূল সন্ধিবৃত্তি/পড়িল ব্যাকণটীকা/গণবৃত্তি সমাসিকা/ অমর জুমর বর্ণ নানা/জানিতে সন্ধির তত্ত্ব/পড়িল উজ্জ্বল দত্ত/পড়িল দুর্ঘটবৃত্তি/ধীর সভায় চক্রবর্তী/ ...নানা ছন্দে পড়িল পিঙ্গল। —বণিক্‌কাণ্ড, চণ্ডীমঙ্গল (কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম)

২. (ক) উদ্দেশে আমরা সব তোমার টিপ্পনী। লই পড়ি পড়াই শুনহ দ্বিজমণি। —ভক্তিরত্নাকর, দ্বাদশতরঙ্গ।

তাছাড়া (খ) আপনি করেন প্রভু সূত্রের টিপ্পনী (চৈতন্য ভাগবত, আদিখণ্ড, সপ্তম অধ্যায়)।

৩. (ক) ব্যাকরণ পড়হ নিমাই পণ্ডিত তোমার নাম।
বাল্যশাস্ত্রে লোকে তোমার কহে গুণগ্রাম।।
ব্যাকরণ-মধ্যে জানি পড়াহ কলাপ।। —চৈতন্যচরিতামৃত ১।১৬।।২৯-৩০

(খ) আবিষ্ট হইয়া প্রভু করেন ব্যাখ্যান। সূত্রবৃত্তিটীকায় সকল হরিনাম।। —চৈতন্যভাগবত ২।১

৪. রথেন ভ্রাময়েৎ পুরম্। অথবা হস্তিযানেন স্কন্ধযানেন বা পুনঃ।।
বিতানবস্ত্রসংছন্নং পতাকাধ্বজশোভিতম্। পুস্তকং বিধিবৎ পূজ্যং—।
পশ্চাত্তু নৃপতির্গচ্ছেৎ সসৈন্যপরিবারিতঃ।।

এই সব প্রসঙ্গে বিস্তারিত তথ্য আছে কালীকুমার দত্তশাস্ত্রীর প্রাচীন ভারতে পুঁথির মর্যাদা, মহামহোপাধ্যায় অনন্তলাল ঠাকুরের Manuscriptology from Indian Sources, দিলীপকুমার কাঞ্জিলালের Manuscriptology ইত্যাদি প্রবন্ধে। এগুলি অধ্যাপক রত্না বসু সম্পাদিত Aspects of Manuscriptology শীর্ষক পুঁথিবিদ্যার দিগ্‌দর্শন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। প্রকাশক—দি এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রথম প্রকাশ ২০০৫, পুনর্মুদ্রণ ২০০৯।

৫. চিঠিপত্র, ষষ্ঠ খণ্ড, পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা ২১৩-২১৪।

৬. 'রবীন্দ্রনাথ আমাকে অনুরোধ করেন যে আমি যেন তাঁকে ভারতবর্ষ থেকে চীন ও জাপানে প্রেরিত সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি সমূহের সন্ধান এবং উক্ত পাণ্ডুলিপিগুলির প্রতিলিপি ভারতে নিয়ে আসবার উপায় জানাই।' —প্রসঙ্গ শিতোকু হোরি, জাপান ও রবীন্দ্রনাথ : শতবর্ষের বিনিময়, কাজুও আজুমা, এন.ই পাবিলিশার্স, কলকাতা ৭০০০৩৫, প্রথম সংস্করণ, ২০০৪।

৭. অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় লিখিত 'প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার : রবীন্দ্র উদ্যোগ' গ্রন্থে বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা আছে। (প্রকাশক : পুস্তক বিপণি, কলকাতা)। 'কীর্তিরক্ষণ' নামে ভারতের জাতীয় পাণ্ডুলিপি মিশনের জার্নাল, বর্ষ ৬, সংখ্যা ১-২, ২০১০-এ মৃন্ময় চক্রবর্তীর প্রবন্ধটিও দ্রষ্টব্য।